নারীবাদ : একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মোছাঃ রূপালী খাতুন*

Abstract: Feminism is a range of socio-political movements and ideologies that aim to define and establish the political, economic, personal and social equality of the sexes. The word `Feminism' originated in the nineteenth century Europe. At the very beginning, the concept of feminism has developed in Pythagorean society in ancient Greece and it introduced by women. In seventeenth century, Feminist ideology enhanced through French women writers. Women awakening in the western society has influenced by Industrial revolution of eighteenth century and American Independence movement. Many scholars consider feminist campaigns to be a main force behind major historical and societal changes for women's rights. Feminist advocacy is, and has been, mainly focused on women's rights, some argue for the inclusion of men's liberation within its aims, because they believe that men are also harmed by traditional gender roles. Simultaneously, Feminist theory which emerged from feminist movements, aims to understand the nature of gender inequality by examining women's social roles and lived experiences. The fundamental objective of feminism is the emancipation of women. To achieve this goal there is a great deal of theoretical differences among feminists due to purpose and way out. Some principal theories are such as Liberal feminism, Radical feminism, Marxist feminism, Socialist feminism, Existential feminism, Cultural feminism, Eco-feminism, Post-modern feminism and so on.

নারীবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়

বর্তমানকালে 'নারীবাদ' বহুল আলোচিত এবং সর্বজনবিদিত একটি শব্দ। নারী প্রগতিমূলক এ প্রত্যয়টির উৎপত্তির বহু পূর্বে বিশ্বে নারী অধিকারের দাবি উঠেছে। মানব ইতিহাসে দেখা যায় সুপ্রাচীন কাল থেকে সারা বিশ্বে সমাজব্যবস্থায় পুরুষতান্ত্রিকতা তথা পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব প্রচলিত ছিল। এখানে কঠোর অবরোধপ্রথা এবং সামাজিক বিধি-নিষেধের বেড়াজালে নারীকে অধস্তন করে রাখার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মেয়েদেরকে শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল প্রতিপন্ন করে নানা প্রগতিশীল কাজ থেকে দূরে রাখা হয়। ফলে নারীরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে সমাজের জন্য বোঝা হয়ে যায়। তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং সার্বিকভাবে পিছিয়ে পড়ে। পরবর্তীতেকালে মেয়েরা ধীরে ধীরে অনুধাবন করে তাদের নিজেদের অধিকার আদায়ের পথ নিজেকেই তৈরি করে নিতে হবে। এভাবে ক্রমান্বয়ে পিতৃতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী নারী অন্দোলন গড়ে উঠে। মূলত নারীর ন্যায্য ও যৌক্তিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যেই "নারীবাদ" নামক শব্দটির সূত্রপাত ঘটে। সময়ের আবর্তে দেশ-কাল-পাত্রভেদে নারীবাদ নতুন নতুন এবং প্রগতিশীল রূপ ধারণ করতে থাকে। আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বিকাশের সাথে সাথে নারীবাদের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নারীবাদী ভাবধারা দ্বারাই নারী তার অসীম ক্ষমতা, আত্মসম্মানবোধ, যোগ্যতা, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হতে পেরেছে। নারী যে পুরুষের ন্যায় মানুষ এবং সমাজে সে বহুমুখি অবদান রাখতে পারে এ আত্মবিশ্বাস নারীর মধ্যে জাগ্রত করে নারীবাদ। নারীবাদের প্রবক্তাগণ প্রতিনিয়ত নানা কর্মসূচির মাধ্যমে এ ধারণার বিকাশ ঘটিয়ে চলেছেন। বর্তমানে পৃথিবীর সর্বত্র নারীরা পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে পুরুষের সমান অধিকার দাবি করছেন। জাতিসংঘ নারীর যৌক্তিক দাবিসমূহ স্বীকার করে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। তাই নারী প্রশ্ন জাতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে পৌঁছে গেছে, যা নারীবাদের প্রত্যক্ষ ও ইতিবাচক প্রভাবের নামান্তর বলা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে নারীবাদের উদ্ভব, বিকাশ এবং এর বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

প্রবন্ধটির তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সামাজিক ও মানবিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত বিশ্লেষণাত্মক ও গুনগত কাঠামো নির্ভর গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের অপ্রতুলতার কারণে গবেষণার অধিকাংশ তথ্য-উপাত্ত দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিষয় সংশ্লিষ্ট দেশি ও বিদেশি লেখকদের রচিত নানাবিধ গ্রন্থ, গবেষণা পত্রিকা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে প্রকাশিত বিশেষ নিবন্ধ, নারীবাদী আন্দোলনে সক্রিয় কর্মীদের বক্তব্য, লেখনী ও কার্যক্রম এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সাহায্য নেয়া হয়েছে। গুণগত গবেষণা পদ্ধতির সর্বাধিক প্রয়োগ করায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহারের মাধ্যমে গবেষকের যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণ, নিজস্ব চিন্তন, উপলব্ধি ও মতামতকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, গবেষণাকর্মটির মাধ্যমে অধিকতর আধুনিক চিন্তা ধারায় নারীবাদ বিশ্লেষণ করে নারী সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা রয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের সঙ্গে সমতায় নারীর পিছিয়ে পড়ার সূচক নির্দেশিত হয়েছে। নারী অধিকার রক্ষায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকল সদস্যের করণীয় স্থির করার অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে। একইসঙ্গে জেন্ডার সমতা নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী শিক্ষার্থী, গবেষক ও পাঠকের জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ গবেষণার গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা অনিবার্য।

ইংরেজি 'Feminism' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো 'নারীবাদ'। ইংরেজি Feminism শব্দটি এসেছে ফরাসি শব্দ femmenisme থেকে। femmen অর্থ নারী এবং isme অর্থ মতবাদ (মাহমুদা, ২০০৪ : ১০৫)। আভিধানিক অর্থে, স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার বিষয়ক মতবাদই হলো 'নারীবাদ'।

নারীবাদ সম্পর্কে *Encyclopedia Britannica* থেকে জানা যায় যে,

> নারীবাদ একটি বিশ্বাস যা লিঙ্গ তথা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। বৃহৎঅর্থে পশ্চিমাদেশে নারীবাদের উৎপত্তি হলেও সারাবিশ্বে এটি সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও স্বার্থে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। (Encyclopedia, 1992 : 160)

বিশ শতকের প্রারম্ভে ব্রিটেনে নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের নেত্রী ও নারীবাদী লেখক তেরেসা বিলিংটন গ্রেগ নারীবাদের সংজ্ঞায় দিতে গিয়ে বলেছেন,

> নারীবাদ একটি আন্দোলন যা বিশ্বের সকল মানবীয় সম্পর্কগুলো লিঙ্গ সমতার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করে; লিঙ্গের ভিত্তিতে বিশেষভাবে কোন ব্যক্তিকে পৃথকীকরণ প্রত্যাখান করার আন্দোলন, সকল লিঙ্গ গুরুভার এবং লিঙ্গ বিশেষাধিকারের বিলোপ ঘটায় এবং আইন ও প্রথার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে নারী ও পুরুষের সাধারণ মানবিকতার স্বীকৃতি স্থাপন করার সংগ্রাম। (Billington-Greig, 1911 : 82)

নারীবাদ একটি সামাজিক আদর্শ ও আন্দোলন যা লিঙ্গসাম্যে আস্থাশীল এবং লিঙ্গ বৈষম্যবাদী প্রাধান্যের পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোকে ভেঙে লিঙ্গসাম্য ও নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দায়বদ্ধ এবং যা নারীর দৈহিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, যৌনতাকেন্দ্রিক, ক্ষমতাকেন্দ্রিক আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সচেতন ও সম্মিলিত প্রয়াস (সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান, ২০০৬ : ৭৬০)। নারীবাদ কোন একক বা একচ্ছত্র মত নয়, নানা মতের সম্মিলিত শক্তিতেই এর উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলিতে নারী আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক বিকাশ ঘটলেও তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির মতো ভারত এবং বাংলাদেশে নারীশক্তির একক ও সম্মিলিত সচেতন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে নারীবাদের ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, নারীবাদ একটি তত্ত্ব। আর নারীরাদী তত্ত্ব বলতে তাত্ত্বিক, কাল্পনিক বা দার্শনিক কথোপকথনে নারীবাদকে বর্ধিত করা বুঝায়। এ তত্ত্ব লিঙ্গ বৈষম্য বিশ্লেষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করে। নারীবাদের তাত্ত্বিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- আমাদের জ্ঞানের জগতে পুরুষদীক্ষা রয়েছে অর্থাৎ সচেতন ও অবচেতন মনে সমাজের প্রতিটি মানুষের মননে পুরুষবাদ রয়েছে। তাই নারী-পুরুষ সমতার জায়গায় পৌঁছতে হলে পুরুষতন্ত্র থেকে বের হওয়ার উপায় খুঁজতে হবে। সাধারণত পরিবারে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পুরুষের কথার গুরুত্ব পায়, সেখানে নারী সদস্য সে মর্যাদা পায় না। এভাবে নারীর জ্ঞানের বিধিসংগত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার বাধাপ্রাপ্ত হয়। নারীর উপলব্ধি করার বিশেষ একটা ধরন থাকে; কোনো কোনো বিষয় পুরুষের তুলনায় নারী দ্রুত বুঝে যায়। অথচ নারীকে সমাজে নিকৃষ্ট ভাবা হয় এবং তাদেরকে অধীন রাখা হয়। আবার নারীরা সমাজে পুরুষের স্বার্থ যতটা পূরণ করতে পারে ঠিক ততটা গুরুত্ব পায়। সত্যিকারঅর্থে, পুরুষ জগৎকে যেভাবে দেখে তা সবার উপর চাপিয়ে দেয় এবং সেটাই সঠিক বলে সমাজে আদৃত হয়। পুরুষের এসকল ভাবনার কেন্দ্রে থাকে নিজের স্বার্থ। পিতৃতন্ত্র যে প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের চর্চা করছে সেভাবে পুরুষতন্ত্রের করালগ্রাস থেকে মুক্তি সম্ভব নয়। তাই নারীর জন্য নতুন ধারণাগত তাত্ত্বিক কর্মসম্পাদন পদ্ধতি (Conceptual Theoratical Tool) তৈরি করতে হবে। এর নামই নারীবাদ। যা ছাতার মতো নারীকে সুরক্ষা দেয়। এখানে যে বিষয়গুলি গুরুত্ব দিতে হবে তা নিম্নরূপ:

১. সেক্স ও জেন্ডারের পার্থক্য জানতে হবে। সেক্স শারীরিক শ্রেণিবিভাগ যা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়। অন্যদিকে জেন্ডার সাংস্কৃতিক শ্রেণিবিভাগ, যার দ্বারা সামাজ বিভিন্ন রীতিনীতির মাধ্যমে নারী ও পুরুষকে পার্থক্য করেছে। অর্থাৎ জেন্ডার সমাজ নির্মাণ করেছে, তাই এর বিনির্মাণ সম্ভব।

২. নারী বিদ্বেষের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে জানতে হবে। নারী দেখলে টিজ করা, নানা অঙ্গভঙ্গি করা, ইভটিজিং, ধর্ষণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সাধারণত পুরুষরাই করে থাকে, যা যুগ যুগ ধরে সমাজে বহমান। আর এসকল নেতিবাচক আচরণের পশ্চাতে পুরুষতন্ত্র সহায়ক হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে, পুরুষতন্ত্র একটি প্রথা। এ প্রথায় নারীর ঘর, সন্তান জন্ম ও বাইরের কাজ সবকিছুই পুরুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং এখানে মেয়েরা বঞ্চিত, লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পুরুষতন্ত্রে নারীর পাশাপাশি পুরুষও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

নারীবাদের তাত্ত্বিক কাঠামো প্রায়োগে যে সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হবে–

১. দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে যে, পৃথিবীর সর্বত্র কোনো না কোনোভাবে নারী লাঞ্ছিত।
২. কেন এ নিপীড়ন ঘটছে, তা খুঁজে বের করা। এবং
৩. ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যোগে নারী নিপীড়নের ঘটনা নির্মুলের চেষ্টা করা।

নারীবাদ একটি মতাদর্শ, দৃষ্টিকোণ ও চেতনার স্তর; নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের যে কোনো মানুষ তা অনুসরণ করতে পারে। নারীবাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে। তাই নারীবাদকে মানবতাবাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। স্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্ন উঠলে পুরুষকে প্রধান্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। নারীবাদ জানে পুরুষ যে সকল কাজ পারে তা নারীও পারে বরং কিছু কাজ আছে যা কেবল নারীই পারে, পুরুষ পারে না। নারীর কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে বা মূল্যায়ন করতে হবে। পুরুষের সঙ্গে নারীকে তুলনা করা বন্ধ করতে হবে। পিতা, স্বামী ও পুত্র তথা পুরুষের অধীনতা থেকে নারীকে মুক্তি দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় স্বাধীনতা দিতে হবে। নারীর যাবতীয় সমস্যা তুলে ধরা এবং একল সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি কি হবে, কিভাবে নারীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে- তার জন্য নারীবাদের তাত্ত্বিক কাঠামো প্রয়োগের মধ্য দিয়েই যেতে হবে। সর্বোপরি সত্যিকারের নারীবাদের বিকাশ সাধন করতে হবে।

প্রাচীন গ্রিসে প্রথম পিথাগোরীয় দর্শনে নারীবাদ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। পিথাগোরাস[১] একটি অধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভ্রাতৃমূলক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। তার অনুসারিরা তারই নির্ধারিত বিধি-নিষেধ মেনে চলত এবং তার দার্শনিক তত্ত্বসমূহ শিখতো। পিথাগোরীয় সংঘে নারী ও পুরুষকে সমান শর্তে সদস্য করা হতো। সেখানে সম্পত্তির মালিকানা ছিল যৌথ, সবার জীবন যাপন পদ্ধতি ছিল একই রকম সাধারণ। অর্থাৎ নারী- পুরুষের সমতা ছিল। এই সম্প্রদায় পিথাগোরীয় সমাজ নামে পরিচিত, যারা পরবর্তীতে ক্রোতোনের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। পিথাগোরীয় সমাজে সতেরো জন নারীবাদী প্রবক্তার কথা জানা যায়। তবে তাঁদের মধ্যে ছয়জনের নাম আবিষ্কৃত হয়েছে। যথা- এসারা (Aesara), মেলিসা (Melissa), মিয়া (Myia), পেরিকটোন (Periktone), ফিনটিস (Phintys) ও থিয়ানো (Theano) (রাশিদা, ২০০০ : ১৩)। এছাড়া Aspasia নামে প্রাচীন গ্রীসে একজন নারীর নাম জানা যায়। এ সকল নারী দর্শনের নানা বিষয়ের সঙ্গে তদানীন্তন সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে মত প্রকাশ করেন এবং নারী অধিকার রক্ষায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। পিথাগোরীয়রা মনে করেন, সুষ্ঠু সামাজিক জীবন ও আত্মার মুক্তির জন্য প্রয়োজন একটি বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন। তাঁরা নারী পুরুষ উভয়কে সমভাবে বিচার করেছেন, ফলে তাদের সমাজে নারীরা পুরুষের ন্যায় সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে (রাশিদা, ২০০০ : ১৪)। পিথাগোরীয় সমাজে নারীরা সমাজপতি তথা সমাজের পুরুষকে উদ্দেশ্য করে পত্র রচনা করেন। এসব পত্রে তাদের চিন্তা-ভাবনা, অভাব-অভিযোগ, সমস্যা ও তার সমাধানের দিক নির্দেশনা তুলে ধরতেন। পিথাগোরীয় মতবাদে, পুরুষের অন্যান্য কাজের ন্যায় গার্হস্থ্য কাজও সমাজে সমান মর্যাদাপূর্ণ। অর্থাৎ নারীর কাজ গৃহ অভ্যন্তরে বা পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্যে সম্পন্ন হলেও তা পুরুষের বহির্মুখী কাজের নায় সমান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। এ সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সমতা ছিল।

প্রাচীন গ্রীসে প্লেটোর দর্শনেও নারীবাদের ধারণা পাওয়া যায়। আদর্শ রাষ্ট্রে নারীর ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে প্লেটো *Republic* গ্রন্থে সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেন। এ গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে (Book-V) নারী-পুরুষের সমঅধিকার এবং সর্বক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে তিনি মত প্রকাশ করেন। প্লেটো বলেন, রাষ্ট্রের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী, তাই আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা বাস্তবায়ন করতে হলে নারীশক্তিকে কাজে লাগানো প্রয়োজন (হাসনা, ১৯৯০ : ২০)। প্লেটো অভিমত প্রকাশ করেন বিশুদ্ধ সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষ এক নিয়মের অধীনে একই ব্যবস্থার সুফল ভোগ করবে (রাশিদা, ২০০০ : ২০)। এটি দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্লেটো নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। তিনি এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছেন যেখানে নারী-পুরুষের জন্য অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রচলিত থাকবে এবং নারী-পুরুষ উভয়ের সামাজিক দায়িত্ব ও অধিকার একরকম হবে।

আবার রোমান সমাজে প্রথম দিকে নারীর অধিকার না থাকলেও ধীরে ধীরে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। রোমান নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকার হওয়ার, চুক্তি করার এবং বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য মামলা করার অধিকার লাভ করে (বেবেল, ১৯৮৩ : ১৫)। তবে এসময় সমাজে কঠোর পিতৃতন্ত্র প্রচলিত থাকায় নারী পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর যিশুখ্রিষ্টের মতবাদ সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এ মতবাদে বাহ্যিকভাবে নারীর জন্য আধ্যাত্মিক মুক্তি ও অন্যান্য মর্যাদার ঘোষণা দেয়া হলেও বাস্তবে তা ছিল প্রকৃতপক্ষে একটি পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (রেজিনা, ২০১৬ : ৩৪)। এ ধর্মে নারীকে পুরুষের অধীনে থাকার কথা বলা হয়েছে। এক কথায় খ্রিষ্টান ধর্মে নারীকে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক সহ অন্যান্য অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

নারী-পুরুষে সমতা বা নারীবাদের ধারণা প্রথম বিকাশ লাভ করে ফরাসি ক্রিস্টিয়ান ডি পিজান (১৩৬৪-১৪৩০)-এর লেখায়। তিনি *The Book of the City of Ladies* (1405) নামক গ্রন্থে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেন, নারী ও পুরুষ উভয়ে ঈশ্বরের প্রজা এবং মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত। নারী পুরুষের চেয়ে ভিন্ন কোনো প্রজাতি বা গোষ্ঠী নয়। তাই তাদের নৈতিক শিক্ষা থেকে বাদ দেওয়ার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই (মাহমুদা, ২০০৪ : ১০৫)। উল্লেখ্য ক্রিস্টিয়ান ডি পিজান শুধু নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করার কারণে সমাজে নানারকম বৈষম্যের স্বীকার হয়েছিলেন। গ্রন্থটিতে তিনি সমাজে নারীকে অবহেলিত ও অধিকার বঞ্চিত করে রাখায় পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেন। পনেরো শতকে ইউরোপে রেনেসাঁ তথা পুনর্জাগরণের মাধ্যমে মানুষের মেধা, মনন ও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। এসময় সামন্তপ্রথার বিলুপ্তির ফলে গ্রামাঞ্চলে নারী ও পুরুষ ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু সমাজে নারী পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। রেনেসাঁ মানবজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়ন সাধন করলেও সামগ্রিক অর্থে নারীর অবস্থার কোন অগ্রগতি ঘটাতে সক্ষম হয়নি।

প্রকৃতপক্ষে নারীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার পরিবর্তন সূচিত হয় সতেরো শতকের শেষ ভাগ হতে। এসময় থেকেই বিশ্বের ইতিহাসে নারী জাগরণ ও আন্দোলন শুরু হয় বলে অভিমত দেওয়া যায়। ১৬৬২ সালে ডাচ নারী মার্গারেট লুকাস ক্যাভেন্ডিস (১৬২৩-১৬৭৩) তাঁর 'Female Orations' নামক একটি রচনায় বলেন, "পুরুষ আমাদের বিরুদ্ধে দারুণ বিবেচনাহীন ও নিষ্ঠুর আচরণ করে, ওরা সব ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে কিন্তু আমাদের বেলায় অবরোধ সৃষ্টি করে, এমনকি মেয়েদের সাথেও মিশতে দেয় না। আমরা বাদুড় অথবা পেঁচার মতো বাস করি, পশুর মতো ভারবাহী জীব যেন আমরা। আমরা প্রতিনিয়ত পোকামাকড়ের মতো মৃত্যুবরণ করি" (মালেকা, ১৯৮৫ : ১৭)। এ লেখাটিতে একদিকে যেমন নারী অন্তরের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে অন্যদিকে নারীর সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে জেগে উঠার বার্তাও লক্ষণীয়। ১৭৬৫ সালে একজন স্কুল শিক্ষক ও সমাজ সংস্কারক Hannah Woolley (1622-1675) *The Gentle Women's Companion* (1673) নামক বইয়ে মত প্রকাশ করেন যে, নারীর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সমাজের সর্বত্র অবহেলিত এবং পুরুষতান্ত্রিক সমাজই এর জন্য দায়ী। নারীকে পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রে তাঁরা অনন্য অবদান রাখতে পারে (রেজিনা, ২০১৬ : ৩৬)। উল্লেখ্য এ রচনার মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ বৈষম্য এবং মেয়েরা ছেলেদের চাইতে মেধা ও প্রতিভার দিক দিয়ে যে, কোনো অংশে কম নয় সে বিষয়টি সকলের সামনে উঠে আসে। ব্রিটিশ লেখক মেরী এস্টল (১৬৬৬-১৭৩১) তাঁর বিখ্যাত *Some Reflections Upon Marriage* (1700) গ্রন্থেও নারী অধিকার বিষয়ে বলিষ্ঠভাবে আলোচনা করেন (মালেকা, ১৯৮৫ : ১৯)।

আঠারো শতকের শেষার্ধে আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন পাশ্চাত্য সমাজে নারী জাগরণকে প্রভাবিত করে। ব্রিটিশদের বিতাড়িত করে ১৭৭৬ সালে The Declaration of Independence প্রণেতা জন এডামস (John Adams 1735-1826)-এর কাছে তাঁর স্ত্রী আবেগেইল এডামস (১৭৬৪-১৮১৮) 'Remember the Ladies' শীর্ষক একটি চিঠি লিখেন, যা নারীর নিজের অধিকার দাবির সূচনা দলিল বলা যায় (রেজিনা, ২০১৬ : ৩৭)। এটি একটি চিঠি হলেও প্রকৃতপক্ষে লেখাটি ছিল একজন আইন প্রণেতার কাছে বিশ্বের সকল নারীর পক্ষ হতে পেশ করা যৌক্তিক দাবি-দাওয়া। আবেগেইল এডামস আশাবাদ ব্যক্ত করেন দেশ শাসনের জন্য নতুন সংবিধান রচনায় স্বামী জন এডামস নারী অধিকারের বিষয় বিবেচনায় রাখবেন এবং নারীর জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকসহ নানাদিকে গুরুত্ব দিবেন। অন্যদিকে, ১৭৮৯ সালে সংঘটিত ফরাসি বিপ্লবে পুরুষের সাথে নারীরা অংশগ্রহণ করে। তারা ফরাসি রাজতন্ত্র ও পিতৃতন্ত্রের অবসান এবং নারীর জন্য নানা প্রকার ন্যায্য অধিকার দাবি করেন। বিপ্লবী নারী অলিম্পে ডি গাউজেজ (১৭৪৮-১৭৯৩) রচনা করেন *The Declaration of the Rights of Women* (1791)। নারী অধিকারের লক্ষ্যে প্রকাশিত এ ঘোষণা পত্রটি বিরোধিতার মুখে পড়লেও শেষ পর্যন্ত ফরাসি সরকার প্রচণ্ড চাপের কারণে ঘোষণাপত্রের কয়েকটি প্রস্তাব- যেমন, অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ে করার অধিকার, উত্তরাধিকার আইনের স্বীকৃতি, বিবাহ-বিচ্ছেদে নারীর মামলা করার অধিকার ইত্যাদি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। এ আইন নারীর জীবন নিয়ন্ত্রণে ও নারী অধিকার রক্ষায় অনেকটা সফলতা এনে দেয়, যা নারীবাদের একটি বিশেষ অর্জন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

সতের শতকে রেনেসাঁর সময় থেকে বিশ্বব্যাপী যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী দর্শনচর্চার প্রচলন আরম্ভ হলে নারীর প্রতি সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণ প্রসঙ্গে অত্যন্ত যৌক্তিভাবে আলোচনা শুরু হয়। এ সময় ধীরে ধীরে নারী-পুরুষের সমতা দাবি করা হয় এবং এভাবে নারীবাদ শব্দটির উৎপত্তি ঘটে। উল্লেখ্য ১৮৩৭ সালে ফরাসি দার্শনিক ও ইউটোপিয়ান সমাজবাদী চার্লস ফুরিয়ে (১৭৭২-১৮৩৭) ফ্রান্সে সর্বপ্রথম নারীবাদ শব্দটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজি ভাষায় এটি গৃহীত হয় (মাহমুদা, ২০০৪ : ১০৬)। চার্লস ফুরিয়ে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে সমাজ পরিবর্তনের প্রত্যাশী ছিলেন। এসময় ইংল্যান্ডের সমাজে হ্যারিয়েট মার্টিনো (১৮০২-১৮৭৬) *Household Education* নামক নারীশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থে মত প্রকাশ করেন যে, শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত নারী আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না এবং নারী-নির্যাতনও বন্ধ হবে না (মালেকা, ১৯৮৫ : ২৩)। প্রকৃতপক্ষে নারীবাদের মূল লক্ষ্য হলো নারীমুক্তি অর্জন করা। এ লক্ষ্য অর্জনে মত ও পথের বিভিন্নতার কারণে নারীবাদের প্রবক্তাগণের মধ্যে তত্ত্বগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ তত্ত্বগুলির মধ্যে অন্যতম হলো উদারপন্থি নারীবাদ, উগ্রপন্থী নারীবাদ, মার্কসীয় নারীবাদ, সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ, অস্তিত্ববাদী নারীবাদ, সাংস্কৃতিক নারীবাদ, পরিবেশ নারীবাদ, উত্তর আধুনিক নারীবাদ ইত্যাদি।

অন্যদিকে নারীবাদের সক্রিয় আন্দোলন ও তাত্ত্বিক বিকাশের ধারাকে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। ফার্স্ট ওয়েভ বা প্রথম প্রবাহ, সেকেন্ড ওয়েভ বা দ্বিতীয় প্রবাহ এবং সাম্প্রতিক বা তৃতীয় প্রবাহ। প্রথম অবস্থায় নারীবাদ ১৮৪৮ সালের 'সেনেকা ফলস কনভেনশন'[২]-এর মধ্যদিয়ে শুরু হয়ে বিশ শতকের গোঁড়ার দিক পর্যন্ত সামাজিক কাঠামোকে বজায় রেখে নারীর আইনি ও রাজনৈতিক সমানাধিকার অর্জন ও প্রকাশ্য পেশায় বেশি মাত্রায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় প্রবাহের সূচনা হয় বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এসময় সূত্রপাত হয় নারীবাদের প্রধান চারটি ধারা, যথা- উদারপন্থি, প্রগতিবাদী, সাংস্কৃতিক ও সমাজতন্ত্রী। তৃতীয় প্রবাহে শুরু হয় উত্তর আধুনিক, উত্তর উপনিবেশবাদী ও তৃতীয় বিশ্বকেন্দ্রিক নানা নারীবাদের উত্থান। এ পর্বেই ক্রমশ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতীয় পটভূমিতে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠে এ উপমহাদেশের নারীবাদ।

নিচে নারীবাদের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

উদারনৈতিক নারীবাদ

উদারনৈতিক চিন্তাচেতনার অধিকারী নারীবাদীরা অভিমত প্রদান করেন যে, নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য ও সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যকার অসাম্য দূর করে নারীর বিদ্যমান অধস্তন অবস্থার জন্য দায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার ও সংশোধন করে বৈষম্য ও অসমতা দূরা করা সম্ভব। উদারনৈতিক নারীবাদের মূল বক্তব্য হলো: সমাজে প্রচলিত প্রথা ও আইনগত ব্যবস্থার মধ্যে যা নারীর জীবনে সফলতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে তা নারীর অধস্তনতার মূল কারণ (মান্‌নান ও সামসুন্নাহার, ২০০৬ : ৮)। তাই নারীকে পুরুষের ন্যায় সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে, তাহলে নারী প্রগতির পথে অগ্রসর হবে এবং পুরুষের ন্যায় সকল কাজে সমান পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হবে। উদারনৈতিক নারীবাদের অগ্রপথিক ছিলেন Mary Wollstonecraft (1759-1797)। তিনি শৈশবে নিজ মায়ের প্রতি পিতার নিষ্ঠুর আচরণে বিচলিত হন এবং প্রতিবাদ জানান। তখন থেকেই সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষ বৈষম্য তাকে ভাবিয়ে তোলে।

নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে মেরি রচনা করেন *A Vindication of the Rights of Woman* (1792)। এ গ্রন্থে তিনি প্রথমবারের মতো যৌক্তিকভাবে নারীমুক্তির সপক্ষে একটি অকাট্য নৈতিক কাঠামোকে ভিত্তি করে বক্তব্য প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি প্রকাশ করে তিনি তদানীন্তন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আক্রমণের শিকার হন। উল্লেখ্য ফ্রান্সে গ্রন্থটি ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়ে পাঠক সমাজের হাতে যায় এবং প্রশংসিত হয়। ফরাসি সাহিত্যিক ও রাজনীতি বিষয়ক লেখক টমাস পেইন (১৭৩৭-১৮০৯), জো বারলো (১৭৫৪-১৮১২), হেলেন মারিয়া উইলিয়াম্‌স (১৭৬১-১৮২৭) এবং ফরাসি বিপ্লবের নেতা পিয়ারে ফ্রাঁসোয়া টিসট্ (১৭৬৮-১৮৫৪) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ মেরি উলস্টোনক্রাফ্টকে অভিনন্দিত করেন (হাসনা, ১৯৯০ : ৪৩)। মূলত উলস্টোনক্রাফ্ট *A Vindication of the Rights of Women* এমন একটি সময় রচনা করেন যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় তথা সারা পাশ্চাত্য বিশ্বে নারীর মানবাধিকার বিষয়ে তখন পর্যন্ত সচেতনতার সৃষ্টি হয়নি। তিনি এ গ্রন্থে সর্বপ্রথম নারীবাদের একটি মেনিফেস্টো (দাবিনামা) তুলে ধরেন। মেরি উলস্টোনক্রাফ্ট নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি অভিন্ন মানদণ্ড দাবি করেন এবং নারী যে পুরুষের সমমানের মানুষ সে সত্যটি যৌক্তিকতার সাথে বিবৃত করেন। তিনি বলেন, সমাজে প্রচলিত যে সকল মনোভাব বা প্রবণতা এবং রীতিনীতি নারীকে অধস্তন করে রাখার উদ্দেশ্যে গৃহীত হয়েছে সেগুলিকে পরিত্যাগ করে নারীবান্ধব এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি করে নারীমুক্তির পক্ষে একটি স্থায়ী অবস্থান নেওয়া সম্ভব (Wollstonecraft, 1796 : 23)। তিনি বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করেন, নারীর উচিত নিজেকে একজন মানুষ হিসেবে ভাবতে শেখা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজের মেধা ও কর্মদক্ষতার উন্নতিসাধন করা। পুরুষের উপর নির্ভরশীল না হয়ে কর্মসংস্থানে নিজেকে সম্পৃক্ত করা। তাহলে সমতাভিত্তিক সমাজ কাঠামো গড়ে উঠবে এবং এ সমাজে নারী মানবাধিকার সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে (Wollstonecraft, 1796 : 25)। এভাবে তিনি সর্বপ্রথম নারীর জন্য পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার দাবি করেন।

মেরি উলস্টোনক্রাফ্ট গ্রন্থের শুরুতেই বলেন- নারী কেবল পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে কথাটি সত্য নয়। আদমের বুকের হাড় দিয়ে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে- এসব কল্পকাহিনি মাত্র (Wollstonecraft, 1796 : 31)। মেরি উলস্টোনক্রাফ্ট জোরালোভাবে মত প্রকাশ করেন যে, সৃষ্টিকর্তা একটি পূর্ণসত্তা এবং তিনি ন্যায়পরায়ণ। তিনি পুরুষের ন্যায় নারীকেও মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং একই রকম মেধা ও প্রতিভা তথা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান প্রদান করেছেন। তাই নারী কোনো

অংশে পুরুষের চেয়ে কম নয়। তিনি সমসাময়িক ইউরোপ-আমেরিকায় উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত এককথায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সকল শ্রেণির নারীর অধস্তন জীবন পরিলক্ষিত করেন। তাই লেখনীর মাধ্যমে নারীকে এ দুদর্শাগ্রস্ত অবস্থা হতে মুক্তির প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন। তবে পুরুষকে বাদ দিয়ে নয় বরং তাদেরকে নারীর পাশে রেখে প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ায় প্রয়াসী ছিলেন মেরি উলস্টোনক্রাফ্ট।

জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) ব্যক্তি জীবনে একজন পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও নারীবাদী ভাবধারার তাত্ত্বিক ছিলেন। তিনি নিজ পিতা জেমস্ মিল (১৭৭৩-১৮৩৬) ও শিক্ষক জেরেমি বেনথাম (১৭৪৮-১৮৩২)-এর উপযোগবাদ দ্বারা অণুপ্রাণিত হন। মিল রচনা করেন *The Subjection of Women* (1869) এবং তাঁর স্ত্রী হ্যারিয়েট টেইলর মিল (১৮০৭-১৮৫৮) রচনা করেন *Enfranchisement of Women*, উভয় রচনাতে নারী বিষয়ে দুজনের চিন্তাভাবনার সমতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে, শুধু শিক্ষা নয়- পুরুষের মতো নারীকেও নাগরিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করতে হবে। তাহলে নারী উপকৃত হবে এবং সমগ্র সমাজের কল্যাণ সাধিত হবে (Moller, 1980 : 212)। সমাজ দীর্ঘদিন ধরে পিতৃতান্ত্রিকতার চর্চা করছে, এ ব্যবস্থায় নারীকে দুর্বল প্রতীয়মান করে এবং পুরুষকে শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এভাবে যুগ যুগ ধরে নারী অবমূল্যায়িত হয়ে বৈষম্যের শিকার হয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগ ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগ। তাই পুরুষ ও নারী সমান অধিকার লাভ করবে এটাই প্রত্যাশিত। মিল বলিষ্ঠভাবে উল্লেখ করেন, পুরুষের মতো সমশিক্ষার সুযোগ নেই বলে নারীর অধস্তন অবস্থা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, নারীর প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজ করছে না (Mill, 1869 : 212)। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যাবস্থা নারী নিপীড়নের জন্য দায়ী। নারীকে স্বাধীনতা দিয়ে পুরুষের ন্যায় উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে নারীসমাজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। নারী পুরুষের চেয়ে কম দক্ষ নয়। স্বাধীনভাবে অর্থ উপার্জন করে স্বনির্ভর জীবনযাপন করলে নারীর মানসিক শক্তি দৃঢ় হবে এবং কণ্ঠ সোচ্চার হবে। এভাবে সে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিগড় থেকে নিজেকে মুক্ত করে ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করবে। অন্যদিকে সমগ্র মানবসমাজকে উন্নত সেবা প্রদানের জন্য তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটবে। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে মিলের নারীবাদী চিন্তাভাবনা ছিল নির্ভীক ও দুঃসাহসিক।

উদারনৈতিক নারীবাদের প্রবক্তা বেটি ফ্রিডান (১৯২১-২০০৬) *The Feminine Mystique* (1963) গ্রন্থে Mystique অর্থে 'যে সমস্যার কোনো নাম নেই'– এ অর্থে ব্যবহার করেছেন (Friedan, 1994 : 101) । এ গ্রন্থে তিনি নারীরা বিয়ে ও সন্তান পালনকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে কেন– সে প্রশ্নের উত্তর প্রদানের চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন নারী সুপ্রাচীনকাল থেকে স্ত্রী ও মাতৃত্বের ভূমিকায় নিজেকে দেখতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। জগতে এর বাইরেও যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে তার ধারণা নারীর নেই। তাই স্ত্রীত্ব ও নারীত্বের আকর্ষণ থেকে নারীকে মুক্ত করতে হবে, এজন্য নারীকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ঘরের কাজ সম্পাদন করেও নারী বাইরের জগতে নানা কাজে অবদান রাখতে পারে এবং অর্থ উপার্জন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে (Friedan, 1994 : 180) । ফ্রিডান ঘরে ও বাইরে নারী-পুরুষের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। প্রকৃতপক্ষে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা পেলেই পরিবার সুন্দর ও সুখি হতে পারে।

উদারনৈতিক নারীবাদীরা সমাজে নারীর জন্য পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তাঁরা নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর অধস্তন অবস্থার পরিবর্তন দাবি করেন। নারী স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। উদারনৈতিক নারী প্রবক্তাগণের মধ্যে আরো যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম সারাহ্

গ্রাইমকে (১৭৯২-১৮৭২), ফ্রান্সেস রিট (১৭৯৫-১৮৫২), এলিজাবেথ কেডি স্টান্টন (১৮১৫-১৯০২), সুসান বি. এন্টনি (১৮২০-১৯০৬), মিলিসেন্ট গ্যারেট ফসেট (১৮৪৭-১৯২৯), এমিলিন প্যাংহার্স্ট (১৮৫৮-১৯২৯) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রগতিবাদী নারীবাদ

উদারনৈতিক নারীবাদের বিপরীত ধারার নারীবাদ হলো র‍্যাডিকেল ফেমিনিজম (radical feminism)। এ ধারার প্রবক্তাগণ মনে করেন যে, নারীর অধস্তন অবস্থার জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি বহুধা বিস্তৃত ও এর মূল অত্যন্ত শক্ত। তাই এর শিকড় উৎপাটন না করলে নারী মুক্তি পাবে না (সেলিনা ও মাসুদুজ্জামান, ২০০৬ : ৭৬৩)। এককথায় প্রগতিবাদীরা মনে করেন যে, পুরুষের বৈশিষ্ট্য নির্যাতনমূলক এবং তারা নারী ও প্রকৃতি বিদ্বেষী। তাই এমন বৈশিষ্ট্য পরিত্যাগ করতে হবে। নারী ও প্রকৃতিকে প্রাপ্য মর্যাদা দেয় এমন মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। এ ধারার নারীবাদীদের মধ্যে রয়েছেন মেরিলিন ফ্রেঞ্চ (১৯২৯-২০০৯), কেট মিলেট (১৯৩৪-২০১৭), পউলা এস. রথেনবার্গ (১৯৪৩-২০১৮), শুলামিথ ফায়ারস্টোন (১৯৪৫-২০১২) প্রমুখ।

এ ধারার তাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সমূলে ধ্বংস না করলে নারী-পুরুষের সমতা এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ফায়ারস্টোন মনে করেন যে, মানব সমাজে বিদ্যমান মূল শ্রেণি বৈষম্য হচ্ছে পুরুষ ও নারীর মধ্যে। নারী পুরুষের চেয়ে অধস্তন-এর জন্য অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার চেয়ে জীববিজ্ঞানের ব্যাখ্যার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। নারী নিপীড়নের মূল হলো জৈবিক, তাই নারীমুক্তির জন্য জৈবিক বিপ্লব (biological revolution) প্রয়োজন (মান্নান ও সামসুন্নাহার, ২০০৬ : ৩৭)। নারীর প্রজনন ভূমিকার কারণে পুঁজিবাদী সমাজ তাঁকে পারিবারিক জীবনে বন্দি করে এবং এখানে নারীকে মজুরীবিহীন শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়। যদি প্রজননের দায়িত্ব নারীকে পালন করতে না হয় তবে গৃহবন্দি হওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। বরং সে বাইরে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারবে এবং নানারকম সম্মানজনক পেশা অবলম্বন করে অর্থ উপার্জন করতে পারে। তাই ফায়ারস্টোন মনে করেন যে, যখন নারী ও পুরুষ প্রজননমূলক ও উৎপাদনমূলক এরূপ পৃথক ভূমিকা পালন করবে না তখন সমাজে নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে (মান্নান ও সামসুন্নাহার, ২০০৬ : ৩৯)।

প্রগতিবাদী নারীবাদে মেয়েদের মাতৃত্বের (motherhood) বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সূত্রপাত ঘটে। ফায়ারস্টোন মনে করেন, সকল নারীকেই সন্তান জন্ম দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পুরুষতন্ত্র মনে করে একজন উত্তম মাতার পারিবারিক কাজকর্ম ও সন্তান পালন করা ছাড়া আর কোনো ভূমিকা নেই। কেট মিলেট মনে করেন যে, নারী নিপীড়নের প্রধান কারণ নিহিত সেক্স বা জেন্ডার ব্যবস্থার মধ্যে। তিনি *Sexual Politics* (1970) গ্রন্থে বলেন, নারীর স্বাধীনতা লাভের জন্য পিতৃতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট পুরুষের নিয়ন্ত্রণ নির্মূল করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন পুরুষতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে গড়ে ওঠা যৌন সম্পর্ক নির্মূল করা (সূত্র: মান্নান ও সামসুন্নাহার, ২০০৬ : ৪২)। অন্যদিকে মেরিলিন ফ্রেঞ্চ মনে করেন, পুরুষতন্ত্রই হচ্ছে সকল ধরনের নারী নিপীড়নের মূল। এভাবে দেখা যায় প্রগতিবাদী নারীবাদে সরাসরি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তথা পুরুষতন্ত্রকে আঘাত করা হয়েছে। এ ধারার প্রবক্তাগণ সমাজে প্রচলিত পিতৃতন্ত্র ভেঙে দেওয়া, নারী-পুরুষে জৈবিক চাহিদার সমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীকে স্বাধীনতা প্রদানের ব্যাপারে অভিমত দিয়েছেন।

মার্কসীয় নারীবাদ

মার্কসীয় নারীবাদী ভাবধারার অন্যতম প্রবক্তা হলেন কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস্ (১৮২০-১৮৯৫) । উনিশ শতকের মধ্যভাগে তাঁরা সর্বপ্রথম নারীর দাসত্বের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁরা বলেন, একমাত্র শ্রেণি শোষণহীন সমাজেই নারীর সম্পূর্ণ মুক্তি সম্ভব (রেজিনা, ২০১৬ : ৪৫)। মার্কসের তত্ত্বমতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারী-পুরুষে সমতা ছিল, এমনকি পুরুষ নারীকে সম্মান প্রদর্শন করতো। নারী কৃষিকাজ আবিষ্কার করলেও সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে পুরুষ কৃষিকাজ শুরু করে এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের চেয়ে অধিক ফসল উৎপাদন করায় ব্যক্তিগত উদ্বৃত্ত সম্পত্তির মালিক হতে থাকে। এভাবে সমাজে শ্রেণি বৈষম্য এবং তা থেকে শ্রেণি শোষণের উদ্ভব ঘটে। নারী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা হারিয়ে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ঠিক এ ধারার সমাজব্যবস্থায় দাসত্ব, সামন্তবাদিতা, ধনতান্ত্রিকতা ইত্যাদির সূত্রপাত ঘটে। অন্যদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠে। এ ধরনের পরিবারে নারী পরাধীন।

অন্যদিকে এঙ্গেলস্ *The Origin of the Family, Private Property and the State* (1895) গ্রন্থে মার্কসের অনুরূপ বলেন শ্রেণি বা দল সামাজিক উৎপাদনের কাজে মুখ্য ভূমিকা পালন করে এবং তারাই একসময় সে উৎপাদনের ওপর কর্তৃত্ব করে। সামাজিক শ্রেণি বিভেদের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি হয় এবং ধীরে ধীরে সমাজের সকল উৎপাদন ব্যবস্থা পুরুষের হাতে চলে যাওয়ায় পিতৃতান্ত্রিক তথা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের উত্থান ঘটে। তাই বলা যায় নারী চিরকাল পুরুষের অধীনে ছিল না। সভ্যতার ক্রমবিকাশের পথ ধরে শ্রেণি বৈষম্যের সূত্রপাতে পুরুষ কর্তৃক উৎপাদন শুরু করায় একটা পর্যায়ে নারী পুরুষের অধীনে চলে যায় এবং এভাবে পুঁজিবাদ ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের উদ্ভব ঘটে। অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ফলে পরিবার ও সমাজে নারীর গুরুত্ব হ্রাস পায়। এঙ্গেলস্ মাতৃতন্ত্রের তথা জননীবিধির উচ্ছেদকে নারীর চূড়ান্ত পরাজয় হিসেবে বর্ণনা করেন (কনক, ১৯৮৪ : ৩৮)।

মূলত কার্ল মার্কসের মানবতাবাদী দর্শনে পৃথিবীর সকল শোষিত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তির প্রত্যাশা করা হয়েছে। মার্কসের দর্শন এঙ্গেলস্ ও লেনিন পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করে বলেন, শ্রেণি শোষণের সাথে নারীর উপর শোষণ-নিপীড়ন জড়িত। নারী শোষিত হয় শাসক কর্তৃক, আর এ শাসক পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের পুরুষ সদস্যরা। তাই পুঁজিবাদের ধ্বংসের মাধ্যমে নারী মুক্তি লাভ করতে পারে। এ লক্ষ্যে দার্শনিকরা বিশ্বের সকল নারীকে একতাবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। নারীকে গৃহ অভ্যন্তরের অনুৎপাদনশীল কাজ থেকে মুক্তি দিতে হবে অথবা ঘরের কাজে নারীর সাথে পুরুষকেও সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন হবে সমনাধিকারের ভিত্তিতে এবং অর্থনৈতিক দাসত্বমুক্ত। পুঁজিবাদ, শ্রেণিবৈষম্য ও শোষণ মুক্ত সমাজে নারী থাকবে স্বাধীন।

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ

সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের তাত্ত্বিকরা মার্কসীয় প্রবক্তাগণের ন্যায় বিশ্বাস করেন, বর্তমান সমাজে প্রচলিত বুর্জোয়া ব্যবস্থাই নারীর অধস্তন অবস্থার জন্য দায়ী। যে সমাজে ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সম্পদ উৎপাদন করে, কিন্তু গুটিকয়েক শক্তিশালী লোক তা অধিকার করে নেয়, সে সমাজে কেউ বিশেষ করে নারী সত্যিকারভাবে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না। তাই বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস না করলে নারীমুক্তি সম্ভব নয়। এ ভাবধারার অন্যতম প্রবক্তা এলিসন জগার (১৯৪২) বলেন, সমাজতন্ত্রী নারীবাদে মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতাবাদ তত্ত্বের সংশোধিত ভাষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নারী নিপীড়ন ব্যাখ্যা করে। তাই বলা যায় মার্কসীয় মতবাদের মূল বিষয়গুলি কিছুটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও পরিমার্জন করে সমাজতান্ত্রিক নারীবাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারীবাদের ব্যাখ্যায় সমাজতন্ত্রী প্রবক্তাগণ দু'টি রীতি যথা-১. দ্বৈত ব্যবস্থাতত্ত্ব (Dual System Theory) এবং ২. একীভূত ব্যবস্থা তত্ত্ব

(United System Theory) প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। দ্বৈত ব্যবস্থাতত্ত্বে বলা হয় পুঁজিবাদ ও পিতৃতন্ত্র সামাজিক সম্পর্ক ও স্বার্থের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। যখন এ দু'টি কাঠামো পরস্পর যুক্ত হয় তখন মারাত্মকভাবে নিপীড়নের স্বীকার হয় নারী।

ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ ও নারীবাদের তাত্ত্বিক জুলিয়েট মিশেল (১৯৪০-) *Woman's Estate* এবং *Psychoanalysis and Feminism* গ্রন্থদ্বয়ে মার্কসীয় নারীবাদে নারীকে শুধু পুঁজিবাদ ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার বিরোধিতা করেন। মিশেল বলেন নারীর কার্যাবলি এবং প্রজনন, সন্তানের সামাজিকীকরণ ও যৌনতায় যৌথ ভূমিকা দ্বারা নির্ধারিত হয় (Rosemarie, 1998 : 176)। তিনি বিশ্বাস করেন, পুঁজিবাদ ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে পিতৃতন্ত্র নসাৎ না হলে নারী নিপীড়ন চলতে থাকে। অন্যদিকে হাইডি হার্টম্যান (১৯৪৫-) বলেন, পিতৃতন্ত্র নারীর শ্রমশক্তির উপর পুরুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টিকে আছে। তাঁর নিকট পুরুষতন্ত্র হচ্ছে 'পুরুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের একটি সেট (set)' যার বস্তুগত ভিত্তি আছে, এটা পদক্রমিক হওয়া সত্ত্বেও পুরুষদের মধ্যে পারস্পারিক নির্ভরশীলতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে এবং যা তাদেরকে নারীর উপর প্রভূত্ব করতে সক্ষম করে (মান্নান ও সামসুন্নাহার, ২০০৬ : ২৭)। পুঁজিবাদ যেমন শ্রমিককে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, ঠিক একইভাবে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা নারীকে নিয়ন্ত্রণ করতে উৎসাহবোধ করে। তাই পুঁজিবাদ ও পিতৃতান্ত্রিকতা পৃথকভাবে প্রতিহত করতে হবে, তবেই নারীমুক্তি ঘটবে। এককথায় সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ শুধু পুঁজিবাদ বা পুরুষতান্ত্রিকতা নয় সম্পূর্ণ সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনের জোর দাবি জানায়।

অস্তিত্ববাদী নারীবাদ

সিমন দ্য বুভোয়া (১৯০৮-১৯৮৬) অস্তিত্ববাদী নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা। তিনি *Second Sex* (1949) গ্রন্থে উল্লেখ করেন সমাজ পুরুষকে ইতিবাচক ও নারীকে নেতিবাচক (দ্বিতীয় লিঙ্গ) হিসেবে চিহ্নিত করেছে, অর্থাৎ পুরুষ হলো স্বসত্তা (self) এবং নারী হচ্ছে 'অপর' (other)। অপর স্বসত্তার জন্য হুমকীস্বরূপ তথা নারী পুরুষের কারণে বিপদগ্রস্ত (Rosemarie, 1998 : 179)। তিনি বলেন, সন্তান ধারণের ক্ষমতা প্রকৃতিগতভাবে শুধু নারীরই আছে এবং নারী সন্তান জন্মদান করে বলেই পুরুষ হতে পৃথক সত্তায় পরিণত হয়, তবে পুরুষ হতে খানিকটা পৃথক হলেও তাঁরা পুরুষ হতে অধস্তন নয়। দীর্ঘদিন হতে নারীকে একটি যৌনসত্তা হিসেবে দেখতে পছন্দ করে পুরুষ এবং নারীকে দ্বিতীয় সত্তা ভাবে। বুভোয়া বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, কীভাবে নারী কোনো রকম প্রতিবাদ না করে, বিষয়টি মেনে নিয়ে সুখ অনুভব করে। নিজ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, পুরুষের বিপরীতে পরমসত্তা হিসেবে নিজেকে দাঁড় করানোর মতো বাস্তব কোন উপায় নারী খুঁজে পায় না। নারী নিজেদের মধ্যে পরস্পরের সাথে যুক্ত নয়, বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের দ্বারা পিতা বা স্বামীর সাথে যুক্ত আর এজন্য নারী পিতৃতন্ত্রকে নস্যাৎ করার কথা ভাবতে পারে না (Beauvoir, 1953 : 675)। পিতৃতন্ত্র ধ্বংস হলে তাঁরা যদি নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে না পারে মূলত নারী একরকম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা নারীকে দুর্বলচিত্তের করে গড়ে তুলেছে। বুভোয়া এসব অবাস্তব চিন্তাভাবনা থেকে নারীকে মুক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

সামাজিক ভূমিকা স্পষ্ট করার মধ্যদিয়ে নারীকে 'অপর' (other) নয় বরং 'স্বসত্তা' (self) হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বুভোয়া বলেন, কেউ নারী হয়ে জন্মায় না বরং কন্যা শিশু জন্মের পর থেকেই সমাজ তাকে শেখাতে থাকে সে নারী, অর্থাৎ পুরুষের চেয়ে অধিকতর নিকৃষ্ট প্রাণী। তিনি অভিযোগ করেন নারী ও পুরুষের মধ্যে গভীর ভালোবাসা থাকলেও বিবাহ প্রথার নিয়ম-কানুনে কর্তব্য ও অধিকার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ করে দেখানো হয়, যা দ্বারা বিয়ের মাধ্যমে নারী পুরুষের দাসিতে

পরিণত হয়। আবার গর্ভধারণের মাধ্যমে নারী তার নিজের সত্তা হারিয়ে 'সন্তানের মা' পরিচয়ে পরিচিত হয়। তাই স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকা নারীর স্বাধীন সত্তা বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে (Beauvoir, 1953 : 679)। অন্যদিকে কর্মজীবী নারীও নারীত্বের বেড়াজালে আরো বেশি বন্দি হয়ে যায়। সমাজ প্রত্যাশা করে কর্মজীবী নারী সারাক্ষণ আদর্শ নারী হয়ে থাকবে এবং নারীর সামাজিক কাজগুলি আরো বেশি গুছিয়ে সম্পন্ন করবে। তাই কর্মজীবী নারী কর্মক্ষেত্র ও সমাজ- দু'টি অবস্থানে মানিয়ে চলতে গিয়ে এক প্রকার পরাধীন জীবন অনুভব করে।

তাই নারীর উচিত নিজেকে নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখা। নিজের ও সমাজের কল্যাণের জন্য নারীকে Second Sex (দ্বিতীয় লিঙ্গ) বা 'অপর' (other) নয় বরং নিজেকে স্বসত্তা বা subject হিসেবে বিকশিত হতে হবে। এজন্য নারীকে 'পিতৃতান্ত্রিক' সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হতে হবে এবং নিজেদের দাবি-দাওয়া ও অধিকারের কথা বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করতে হবে (Beauvoir, 1953 : 680)। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নারীকে অর্থ উপার্জন করতে হবে, বেশি পরিশ্রম হলেও ঘরের কাজ করতে হবে– এভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়। আবার নারীকে লেখনির মাধ্যমে নিজেদের অসুবিধার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবে এবং সর্বোপরি সমাজ পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করতে হবে।

সাংস্কৃতিক নারীবাদ

তাত্ত্বিক সারাহ্ মার্গারেট ফুলার অসোলি (১৮১০-১৮৫০) বলেন, নারীর মধ্যে কতিপয় গুণ আছে যা পুরুষের মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত। এসব গুণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ধৈর্য, সেবা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, ধীরতা, মাতৃত্বসুলভ বিষয় প্রভৃতি। নারীর প্রকৃতি অসহিংস এবং পুরুষের প্রকৃতি আক্রমণাত্মক। এজন্য একটি সুখি ও সমৃদ্ধশালী পরিবার গঠনের জন্য প্রয়োজন নারীর গুণাবলির বিকাশ ঘটানো (Margaret, 1845 : 101)। মার্গারেট ফুলার অসোলি মনে করেন যে, নারীর অভ্যন্তরীণ গুণাবলির চর্চা অব্যাহত থাকলে তাঁর দূরদৃষ্টির বৃদ্ধি ঘটবে এবং সমাজের মঙ্গল বয়ে আনবে। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, সাংস্কৃতিক নারীবাদে সমাজে পুরুষের প্রাধান্য বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ এ মতবাদের প্রবক্তাগণ নারীকে তাঁর গুণের বৃদ্ধি ঘটানোর উপর বেশি গুরুত্ব দেন। অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা দ্বারা নারী পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করবে বলে অভিমত দেওয়া হয়। অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তিত করতে পারলেই প্রকারান্তে সমাজে নারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

অন্যদিকে শুধু শারীরিক অবস্থায় নারী হওয়ার কারণে অর্থাৎ সন্তান জন্মদান, সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্ব নেওয়ার মধ্যদিয়ে নারীকে পুরুষের চাইতে ভিন্ন শ্রেণির মনে করা অন্যায়। উপরন্তু এসবের মধ্য দিয়ে নারীর অন্তর্গত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। নারী বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ক্যারোল গিলিগান (১৯৩৬-) জন্ম নিয়ন্ত্রণ, গর্ভধারণ ও গর্ভপাত বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি বলেন এ শরীরবৃত্তীয় বিষয়গুলি একান্তভাবে নারীর সাথে সংশ্লিষ্ট কেবল তা নয়, এগুলি নারী স্বাধীনতাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খর্ব করে ও নিয়ন্ত্রণ করে। নারীর কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করে, এমনকি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও অনেক সময় হরণ করে। অন্যদিকে নারী বৌদ্ধিক ও যৌক্তিক সামর্থ্যে বলীয়ান। তাই নানা প্রতিবন্ধকতা থাকলেও পুরুষের ন্যায় নৈতিক দ্বন্দ্ব সমাধান করতে নারী সক্ষম (রাশিদা, ২০০০ : ৩৯-৫৭)। মূলত সাংস্কৃতিক নারীবাদ সমাজে নারী-পুরুষ দ্বন্দ্ব নিয়ে গভীরে অনুসন্ধান করে এবং প্রয়োজন মত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস ব্যক্ত করে।

পরিবেশ নারীবাদ

পরিবেশ নারীবাদ বা Ecofeminism শব্দটি সর্বপ্রথম Francoise d'eaubonne (1920-2005) বা ফ্রাঁসোয়া দোবান সর্বপ্রথম *Feminism or Death* নামক রচনায় ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, পরিবেশ বিপ্লব ঘটানোর কাজে নারীর ক্ষমতা আছে (Waren, 1997 : 237)। এ মতবাদে কেবল নারীকে প্রকৃতির সাথে এবং পুরুষকে সংস্কৃতির সাথে তুলনা করা হয় না, বরং নারী-পুরুষ উভয়কে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। তাত্ত্বিক ভেল প্লামউড (১৯৩৯-২০০৮) *Feminism and the Mastery of Nature* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, প্রকৃতি যেমন সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে, গ্রহণ করে, আত্মস্থ করে, সেরকম নারী ও পুরুষ উভয়ে প্রকৃতির সাথে একীভূত হয়ে বৈষম্যবাদী সাংস্কৃতিক অবস্থার বিলোপ ঘটাতে সক্ষম হয় (রাশিদা, ২০০০ : ১০৫)। আবার পরিবেশ নারীবাদ নিম্নোক্ত বক্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা:

> প্রথমত : নারীর উপর আধিপত্য বিস্তার নিপীড়নের সাথে প্রকৃতির উপর আধিপত্য ও শোষণের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে।
>
> দ্বিতীয়ত : পুরুষতন্ত্রে নারীকে প্রকৃতি এবং পুরুষকে সংস্কৃতির সাথে তুলনা করা হয়। বাস্তবে সংস্কৃতিকে প্রকৃতির চেয়ে বড় করে দেখা হয়, তাই নারীকে পুরুষের অধস্তন ভাবা হয়।
>
> তৃতীয়ত : নারী এবং প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা যায়।
>
> চতুর্থত : নারীবাদী ও পরিবেশবাদী আন্দোলন একযোগে পরিচালিত হতে পারে এবং এভাবে সমাজের নানা অসঙ্গতি দূর হতে পারে। (মান্নান ও সামসুন্নাহার, ২০০৬ : ৫১)

Karen J. Warren (1947-) *Ecological Feminism* গ্রন্থে নারীর সমস্যাগুলিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেন। নারীর সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে তার সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে হবে। পরিবেশের সাথে নারীর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা প্রকৃতপক্ষে নারী সম্পর্কে মানুষকে যত্নশীল করে তুলবে। পরিবেশ ও নারী উভয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্যে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। তাই পরিবেশ নারীবাদীরা মনে করেন, পরিবেশ এবং নারী উভয়কেই রক্ষা করতে হবে।

উত্তর আধুনিক নারীবাদ

উত্তর আধুনিক নারীবাদের প্রবক্তাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য Jacques Lacan (1901-1981), Michel Foucault (1926-1984), Jacques Derrida (1930-2004), Luce Irigaray (1930-), Helen Cixous (1937-), Julia Kristeva (1941-) প্রমুখ। এ সকল তাত্ত্বিকরা মনে করেন আধুনিকতার সাথে পুরুষতন্ত্রের সম্পর্ক রয়েছে, তাই এটি বাতিল না করলে নারীমুক্তি ঘটবে না। আধুনিক চিন্তা-চেতনার মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য অর্থাৎ নারী-পুরুষ ভিন্নতার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। অন্যদিকে শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করলেই নারীমুক্তি পাবে না। তাই শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা নারীর নানা অধিকার অর্জনে সহায়ক হলেও চিন্তা কাঠামোতে কোনো পরিবর্তন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে (মান্নান ও সামসুন্নাহার, ২০০৬ : ৫১)। নারীকে সনাতন চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করতে হবে এবং ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় মনোযোগী হতে হবে। তাঁদের মতে নারী-পুরুষ সম্পর্ক মূলত রাজনৈতিক এবং পুরুষতন্ত্রের মূল ভিত্তি ক্ষমতা বা শক্তি। এজন্য পুরুষতন্ত্রকে ভেঙে দিতে হবে, পাশাপাশি নারীকে সাহসী করে গড়ে তুলতে হবে। দার্শনিক Helen Cixous মনে করেন, যৌনতা ও ভাষাগত উভয়দিক থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান (Maggie, 1992 : 134)। এজন্য নারীকে সাহিত্য রচনা করতে হবে এবং এমন বিষয় নির্ধারণ করবে যার মাধ্যমে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে রূপান্তর ও পরিবর্তন সাধনে সহায়ক হবে। এভাবে পুরুষতন্ত্রে পরিবর্তিত বিপরীত ধারণার জন্ম হবে এবং নারীমুক্তি সম্ভব হবে।

নারীবাদী ও মনোবিশ্লেষক Luce Irigaray মনে করেন, একজন নারী ও পুরুষের ভাবনার জগতে তথা কল্পনার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। তাই নারীর বন্দিত্ব, নারীমুক্তি ও নারীমুক্তির কৌশল ইত্যাদি তাঁর রচনায় গুরুত্ব পায়। উল্লেখ্য ইরিগারে নারীমুক্তির তিনটি কৌশলের কথা উল্লেখ করেন, যা নারী সাহিত্য রচনার মাধ্যমে অবলম্বন করতে পারে। যথা:

১. প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ (Word)ই পুরুষতান্ত্রিক। তাই ভাষার প্রকৃতির প্রতি নারীকে নজর দিতে হবে।
২. নিজেদের মুক্তির জন্য নারী তাদের কথা বলার ধরণ ও চিন্তা করা বিষয়টি পরিচর্যা করবে।
৩. পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নারী মূকাভিনয়ের কৌশল তথা পুরুষের সামনে নিজের প্রতিকৃতিকে বড় করে তুলে ধরতে পারে। (মান্নান ও সামসুন্নাহার, ২০০৬ : ৫১)

দার্শনিক ও মনোসমীক্ষণবিদ জুলিয়া ক্রিস্টেভা মত প্রকাশ করেন যে, নারী বলতে কিছু নেই (Women as such does not exist)। 'একজন নারী' (one is a women) বিশ্বাসটি 'একজন পুরুষ' (one is a man) বিশ্বাসটির মতো প্রায় হাস্যকর ও অস্পষ্ট। কাজেই 'আমরা নারী' (we are women) কথাটি আমাদের দাবির জন্য বিজ্ঞাপন বা স্লোগান হিসেবে ব্যবহার করি। তাই মূল কথা একজন নারী হতে (be) পারে না; এমনটি হওয়ার (being) প্রক্রিয়াতেও থাকে না (Kristeva, 1979 : 49)। উত্তরাধুনিক নারীবাদের প্রবক্তাগণ নারী সংশ্লিষ্ট সকল পুরাতন ধ্যান-ধারণা ভেঙে দিয়ে নতুন একটি অগ্রসরমান ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে চেয়েছেন যার মাধ্যমে নারীসমাজ সংস্কৃতিতে তাদের বিশেষ স্থান দখল করতে পারে।

এভাবে সুপ্রাচীনকাল হতে নারীর সামাজিক অবস্থান ও অধিকারের বিষয় নিয়ে নানা রকম মতবাদের সূত্রপাত ঘটেছে। নারী যে মানুষ এবং মানুষ হিসেবে পুরুষের ন্যায় সকল প্রকার অধিকার ভোগ করার দাবিদার সে কথাটি বিভিন্ন লেখনি, তত্ত্ব ও মতাদর্শের মাধ্যমে লোকচক্ষুর সম্মুখে উঠে এসেছে। পাশ্চাত্য সমাজের নারী জাগরণ ও আন্দোলনের প্রভাব ভারতবর্ষ তথা বাংলার সমাজে পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীনকাল থেকে বাংলার নারীরা নানাভাবে অধিকার বঞ্চনার শিকার হতে থাকে এবং ব্রিটিশ শাসনামলে এ অবস্থার চূড়ান্তরূপ ধারণ করে। লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশে স্বাধীনতার বহু পূর্ব থেকেই নারীবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলে নারী কর্মীরা– নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, লিঙ্গ সমতা, অর্থনৈতিক সুযোগ, কর্মশালায় অংশগ্রহণ, রাজনীতিতে সমান প্রতিনিধিত্ব, প্রজনন অধিকার, পারিবারিক আইন সংস্কার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সোচ্চার ছিলেন।

আবার সকল পুরুষ যে পুরুষবাদী তা কিন্তু নয়। বাংলায় দেখা যায়, উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের নেতা ও হিন্দু মনীষীর প্রচেষ্টায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া শুরু করে। সদর্থক ভাবনার অধিকারী এই সংস্কারপন্থিরা তদানীন্তন সমাজে নেতিবাচক মানসিকতার পুরুষ নেতাদের দ্বারা পরিচালিত মেয়ে শিশু হত্যা, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহে নিষেধাজ্ঞা, সদ্য বিধবা নারীকে মৃত স্বামীর চিতায় তুলে দিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা ইত্যাদি অনাচারের বিরুদ্ধে একটা সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলেন। এসকল বাঙালি সমাজ সংস্কারক পাশ্চাত্য জগতের নারীবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হন সেকথা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বাংলায় উদারনৈতিক নারীবাদী ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। বিশ শতকের শুরুতে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) নারীজাগরণ ও আন্দোলনে কাজ শুরু করেন। রোকেয়া উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক নারীবাদী ভাবধারা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে বাংলায় সমাজতন্ত্রের প্রভাব বিস্তার করায় এসময় মার্কসীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদী ভাবধারা

পরিদৃষ্ট হয়। পরবর্তীকালে বাঙালি নারীরা ধীরে ধীরে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে থাকেন এবং বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অন্যদিকে আন্তর্জাতিকভাবে ১৯৭৫ সালকে জাতিসংঘ "International Women's Year" এবং ১৯৭৬-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সময়কে "The Decade for Women" ঘোষণা করে, যা ১৯৭৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর গৃহীত হয়। এ সময় প্রত্যেক দেশের কাছ থেকে পৃথকভাবে নারীর সার্বিক অবস্থার রিপোর্ট চাওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নারী উন্নয়নে বিভিন্ন দেশের সরকারকে নির্দেশ দেয়া হয়, যা বিশ্বে নারী উন্নয়নে এক মাইলফলক হিসেবে কাজ করে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম বিষয় ছিল নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, বিদ্যমান ধর্মীয় আইনের সংস্কার, নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করা ইত্যাদি। বর্তমান বাংলাদেশে নারীবাদ বলতে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সর্বক্ষেত্রে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করাকে বোঝায়। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "রাষ্ট্র ও গণ জীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবেন"। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২ : তৃতীয় ভাগ, ২৮/২) সংবিধানের এই ধারার মাধ্যমে রাষ্ট্র নারী-পুরুষে সমতা প্রতিষ্ঠার অন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭৬ সালে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় মহিলা সংস্থা এবং ১৯৭৮ সালে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে নারী বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৪ সালে মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয় যা ১৯৯০ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে উন্নীত হয়। নারী উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার ১৯৯৭ সালে প্রথমবারের মতো জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেন, যা আরো পরিশীলিতভাবে পুনরায় ২০১১ সালে প্রণীত হয়। নাগরিকত্বের পরিচয়স্বরূপ পিতার নামের পাশে মাতার নাম লিপিবদ্ধ করা এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাসে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে নারী উন্নয়ন, নারী নির্যাতন বন্ধ, নারী পাচার প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তাবিধান এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল স্রোতধারায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৮ টি প্রকল্প এবং ২১ টি কর্মসূচি চলমান রয়েছে। সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সমন্বিত সেবা প্রদানের নিমিত্তে বর্তমান সরকারের একাগ্রতা অতুলনীয়। আজকের দিন পর্যন্ত নারী সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সুযোগ সুবিধা যা সুদীর্ঘ কাল ধরে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে তা নারীবাদেরই সদর্থক ফল।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, নারীবাদ একটি চলমান প্রক্রিয়া যা বহুকাল পূর্বের নারী বঞ্চনার অবসানের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। নারীকে সচেতন করে তাদের মধ্যে জাগরণ ঘটিয়েছে, নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে এবং বিশ্বব্যাপী নারীমুক্তি আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আজ সারাবিশ্বে জেন্ডার সমতার যে ধারণার বিকাশ ঘটেছে, তার পেছনে নারীবাদ প্রত্যয়টি প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছে। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী প্রশ্নটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে নারীবান্ধব নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারী অধ্যয়ন পৃথক শাখা হিসেবে চর্চিত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত গবেষণার মাধ্যমে নারী বিষয়ক অগ্রগতির নব দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। ফলে দুঃসহ জীবনের ঘন ঘোর অনুকার কাটিয়ে বিশ্বের নারীসমাজ আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের শত শাখায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করছে। পরিবার, সমাজ, শিক্ষা, প্রশাসন, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে দেশ বিদেশের নারী অত্যন্ত সফলতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। তবে একুশ শতকের তৃতীয় দশকে এসেও বাঙালি নারী সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারেনি, সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিতও হয়নি।

বর্তমানে বাংলাদেশের নারীরা সকল ধরনের নিরাপত্তাসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুধু নারী হওয়ার কারণে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাই নারী সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সমস্যা সমাধান এবং নারীর পূর্ণাঙ্গ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশে নারীবাদী আন্দোলন চলমান রয়েছে। আশার কথা হলো– নারীর ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি সম্মুখপানে অবিরাম ছুটে চলেছে। এর মাধ্যমে অদূর ভবিষ্যতে নারীর পরিপূর্ণ মুক্তি অর্জন সম্ভবপর হবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

টীকা

১. সামোসের পিথাগোরাস (Pythagoras of Samos খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭২-৪৯৭ অব্দ) ছিলেন একজন আয়োনিয় গ্রিক দার্শনিক, গণিতবিদ এবং পিথাগোরাসবাদী দর্শনের জনক। তিনি এমন কিছু নীতির উদ্ভাবন ঘটিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে প্লেটো ও এরিস্টটলের মতে দার্শনিকদের প্রভাবিত করে। পিথাগোরাস এজিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূল অর্থাৎ বর্তমান তুরস্কের কাছে অবস্থিত সামোস দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মিশরসহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের পর ৫৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের দিকে ইতালীর দক্ষিণে অবস্থিত গ্রিক উপনিবেশ ক্রোতোন নামক স্থানে চলে যান এবং এখানে একটি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ভ্রাতৃত্বমূলক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এ সম্প্রদায় ক্রোতোনের সমাজ ও রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করে। এভাবে প্রাচীন গ্রিসে পিথাগোরীয় দার্শনিক ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. সেনেকা ফলস কনভেনশন পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নারী অধিকার রক্ষার জন্য একটি সম্মেলন। ১৮৪৮ সালের ১৯-২০ জুলাই নিউইয়র্কের সেনেকা ফলস শহরের Wesleyan Chapel এ সম্মেলনটির আয়োজন করা হয়। এখানে বিশ্বের নারীর সামাজিক, পারিবারিক এবং ধর্মীয় অবস্থা ও অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়।

উল্লেখপঞ্জি

আগস্ট বেবেল (১৯৭৩)। *নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে*। [অনু. কনক মুখোপাধ্যায়], ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা

কনক মুখোপাধ্যায় (১৯৮৪)। *নারীমুক্তি প্রশ্নে মার্ক্স এঙ্গেলস-লেনিন-স্তালিন*। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা

মালেকা বেগম (১৯৮৫)। *নারীমুক্তি আন্দোলন*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মাহমুদা ইসলাম (২০০৪)। *নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

মোঃ আবদুল মান্নান ও সামসুন্নাহার খানম মেরী (২০০৬)। *নারী ও রাজনীতি*। অবসর প্রকাশনা, ঢাকা

রাশিদা আখতার খানম (২০০০)। *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা

রেজিনা বেগম (২০১৬)। *রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলার নারী (১৯০৫-৪৭)*। বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ঢাকা

সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান [সম্পা.] (২০০৬)। *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

হাসনা বেগম (১৯৯০)। *নৈতিকতা নারী ও সমাজ*। মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

Betty Friedan (1994). *The Feminine Mystique*, Dall, New York

E. B Cole and S. Coultrup-McQuin [eds.] (1992). *Explorations in Feminist Ethics*. Indian University Press, Bloomington

John Stuart Mill (1869), *The Subjection of Women*. Longmans, London

Julia Kristeva (1979). *Feminist Thought*. Edinburgh University Press, United Kingdom

Karen J. Waren, 'Introduction', K. J Waren [ed.]. *Ecological Feminism*. : Routledge, London and New York ; Joseph R. Desjardins (1997). *Environmental Ethics: An Introduction to Environmental Philosophy*. Wardsworth Publishing, New York

Maggie Humm (1992). *Feminism : A* Reader. Routledge, London and New York

Margaret Fuller (1860). *Woman in the Nineteenth Century*. Brown, Taggard and Chase, Boston, Originally Published in 1845

Mary Wollstonecraft (1796). *A Vindication of the Rights of Woman*. J. Johnson, London

Rosemarie Putnam Tong (1998). *Feminist Thought.* Westview Press, Oxford

Simone de Beauvoir (1953). *The Second Sex,* Alice S. Rossi [ed.] 'The Feminist Papers: From Adams to de Beauvoir', Northeastern University Press, Boston

Susan Moller Okin (1980). *Women in Western Political Thought*. Virago Publishing, London

Teresa Billington-Greig (1911). *The Militant Suffrage Movement : Emancipation in a Hurry.* F. Palmer, University of California

The New Encyclopedia Britannica (1992). volume 19, 15th Edition. Encyclopedia Britannica, Inc., Chicago